মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রতীতি

একটি মুক্তির উদ্যোগ প্রয়াস

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৮

প্রকাশক

প্রতীতি

মুক্তির উদ্যোগ
৭২৬/এ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

স্বত্ব

মুক্তির উদ্যোগ

প্রচ্ছদের পেইন্টিং
শাহাবুদ্দিন আহমেদ

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
খন্দকার তোফাজ্জল হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

দেশ

মানুষের যতগুলো অনুভূতি আছে তার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে ভালোবাসা। আর এই পৃথিবীতে যা কিছুকে ভালোবাসা সম্ভব তার মাঝে সবচেয়ে তীব্র ভালোবাসাটুকু হতে পারে শুধুমাত্র মাতৃভূমির জন্যে। যারা কখনো নিজের মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসাটুকু অনুভব করেনি তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আমাদের খুব সৌভাগ্য আমাদের মাতৃভূমির জন্যে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস হচ্ছে গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। যখন কেউ এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাস জানবে, তখন সে যে শুধুমাত্র দেশের জন্যে একটি গভীর ভালোবাসা আর মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশ, এই মানুষের কথা ভেবে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে।

পূর্ব ইতিহাস

যেকোনো কিছু বর্ণনা করতে হলে সেটি একটু আগে থেকে বলতে হয়, তাই বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্যেও একটু আগে গিয়ে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করা যেতে পারে। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুইশ' বছর শাসন-শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গিয়েছে। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব'[১]-এ ঠিক করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আর একটি দেশ তৈরি করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে এলাকা দুটিতে মুসলমানরা বেশি সেই এলাকা দুটি নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটিকে ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেয়া হলো। পাকিস্তান নামে পৃথিবীতে তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটি দেশের জন্ম হলো, যে দেশের দুটি অংশ দুই জায়গায়। এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান এবং এখন যেটি বাংলাদেশ তার নাম পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব, এবং সেখানে রয়েছে ভিন্ন একটি দেশ– ভারত!

বিভেদ, বৈষম্য, শোষণ আর ষড়যন্ত্র

পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল– সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আলাদাভাবে একটু বেশি চেষ্টা করার কথা, কিন্তু

পাকিস্তানের শাসকেরা সেই চেষ্টা করল না। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসেবে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা সবকিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হলো ঠিক তার উলটো, সবকিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। বাজেটের ৭৫% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল বেশি, শতকরা ৬২ ভাগ। সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল সেনাবাহিনীর সংখ্যা, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৫ গুণ বেশি![২]

ভাষা আন্দোলন

অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড়ো নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিক সেটিই শুরু করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে আর ঠিক ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।[৩] সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল।[৪] যেখানে আমাদের ভাষাশহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেখানে এখন আমাদের প্রিয় শহীদ মিনার, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি শুধু বাংলাদেশের জন্যে নয়, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

সামরিক শাসন

একেবারে গোড়া থেকেই পাকিস্তানে শাসনের নামে এক ধরনের ষড়যন্ত্র হতে থাকে, আর সেই ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড় ছিল সেনাবাহিনী। দেশের বাজেটের ৬০% ব্যয় করা হতো সেনাবাহিনীর পিছনে[৫], তাই তারা তাদের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধার লোভনীয় জীবন বেসামরিক মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। নানারকম টালবাহানা করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপতি আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নেন। সেই ক্ষমতায় তিনি একদিন দুইদিন ছিলেন না, ছিলেন টানা এগারো বৎসর। সামরিক শাসন কখনো কোথাও শুভ কিছু আনতে পারে না, সারা পৃথিবীতে একটিও উদাহরণ নেই যেখানে সামরিক শাসন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছে– আইয়ুব খানও পারেনি।

ছয় দফা

দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এতরকম বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি খুব সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্যে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা[৬] ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবরকম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল।[৭] তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর যেরকম অত্যাচার নির্যাতন চলছিল, তার মাঝে ছয় দফা দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের মতো একটি দাবি তোলায় খুব সাহসের প্রয়োজন। ছয় দফার দাবি করার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগের ছোট বড়ো সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়া হলো। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে একটি কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্যে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহিতার একটি মামলার প্রধান আসামি করে দেয়া হলো।[৮]

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কিছুতেই এটা মেনে নিল না এবং সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেল-জুলুম, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর গুলি, কিছুই বাকি থাকল না, কিন্তু সেই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেল না। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল ছাত্রেরা, তাদের ছিল এগারো দফা[৯] দাবি। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন জেলের বাইরে, তিনিও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলন একটি গণবিস্ফোরণে রূপ নিল– কার সাধ্যি তাকে থামায়? ৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ফুটফুটে কিশোর মতিউর, প্রাণ দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ– যার নামে আইয়ুব গেটের নাম হয়েছিল আসাদ গেট। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সহ সব নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। শুধু তাই নয়, প্রবল পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নিল।

তারিখটি ছিল ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ, কেউ তখন জানত না ঠিক দুই বছর পর একই দিনে এই দেশের মাটিতে পৃথিবীর জঘন্যতম একটি গণহত্যা শুরু হবে।

পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেবার কথা ঘোষণা করে, তারিখটি শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। নির্বাচনের কিছুদিন আগে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের

উপকূল এলাকায় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল– এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল। এত বড়ো একটি ঘটনার 'পর পাকিস্তান সরকারের যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত ছিল, তারা মোটেও সেভাবে এগিয়ে এল না। ঘূর্ণিঝড়ের পরেও যারা কোনোভাবে বেঁচে ছিল তাদের অনেকে মারা গেল খাবার আর পানির অভাবে।[১০] ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট পাওয়া মানুষগুলোর প্রতি এরকম অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘৃণায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রচণ্ড ক্ষোভে মাওলানা ভাসানী একটি প্রকাশ্য সভায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে একটি ঘোষণা দিয়ে দিলেন।[১১]

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সারা পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড়ো বড়ো জেনারেলের রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তারা ধরেই নিয়েছিল, নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তাই দলগুলো নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি আর কোন্দল করতে থাকবে আর সেটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থেকে দেশটাকে লুটেপুটে খাবে।[১২] কাজেই নির্বাচনের ফলাফল দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, ফলাফলটি ছিল অবিশ্বাস্য– পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে ১৬০টি আসন পেয়েছে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হলো তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপল্‌স পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।

সোজা হিসেবে এই প্রথম পাকিস্তান শাসন করবে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার করে বলে দিলেন, তিনি ছয় দফার কথা বলে জনগণের ভোট পেয়েছেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ছয় দফার ভিত্তিতে, দেশ শাসিত হবে ছয় দফার ভিত্তিতে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেয়া যাবে না। নিজের অজান্তেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর তার দলবল 'বাংলাদেশ' নামে নতুন একটি রাষ্ট্র জন্ম দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল।

ষড়যন্ত্র

জেনারেলদের ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বড়ো সাহায্যকারী ছিল সেনাশাসক আইয়ুব

খানের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্স পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো। হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লারকানায় 'পাখি শিকার' করতে আমন্ত্রণ জানাল। 'পাখি শিকার' করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগ দিল পাকিস্তানের বাঘা বাঘা জেনারেল। বাঙালিদের হাতে কেমন করে ক্ষমতা না দেয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা সম্ভবত সেখানেই তৈরি হয়েছিল।[১৩]

ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেটি বাইরে বোঝাতে চাইল না। তাই সে ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। সবাই তখন গভীর আগ্রহে সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

এর মাঝে ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভালোবাসা এবং মমতার শহীদ দিবস উদযাপিত হলো অন্য এক ধরনের উন্মাদনায়। শহীদ মিনারে সেদিন মানুষের ঢল নেমেছে, তাদের বুকের ভেতর এর মাঝেই জন্ম নিতে শুরু করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের সেই উন্মাদনা দেখে পাকিস্তান সেনাশাসকদের মনের ভেতরে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটিও দূর হয়ে গেল। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিল সংখ্যালঘু দলে, তার ক্ষমতার অংশ পাবার কথা নয়, কিন্তু সে ক্ষমতার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঠিক দুই দিন আগে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বুকের ভেতর ক্ষোভের যে বারুদ জমা হয়ে ছিল, সেখানে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করল। সারাদেশে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটল তার কোনো তুলনা নেই।

উত্তাল মার্চ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে, এ ঘোষণাটি যখন রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ একাদশের খেলা চলছে। মুহূর্তের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে আসে, পুরো ঢাকা শহর দেখতে দেখতে একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার স্লোগান : 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে মিলিয়ে ৫ দিনের জন্যে হরতাল ও অনির্দিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে কোনোভাবে সাহায্য না করার কথা বলেছিলেন এবং

তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে কারফিউ দেয়া হলো- ছাত্র জনতা সেই কারফিউ ভেঙে পথে নেমে এল। চারিদিকে মিছিল, স্লোগান আর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে তারপরেও কেউ থেমে রইল না, দলে দলে সবাই পথে নেমে এল।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হলো। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করা হলো।[১৪]

পাঁচদিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন। ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[১৫] পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষণ খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষণটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে- অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনাচে কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারির গতিবিধি থামানোর জন্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। দেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে। মাওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলে দিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে।[১৬]

ঠিক এই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠাল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হলেন না। ইয়াহিয়া খান নিজে মার্চের ১৫ তারিখ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার ভান করতে থাকে, এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে। যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে, কিন্তু জনগণের বাধার কারণে সেই অস্ত্র তারা নামাতে পারছিল না। ২১ মার্চ এই ষড়যন্ত্রে ভুট্টো যোগ দিল, সদলবলে ঢাকা পৌঁছে সে আলোচনার ভান করতে থাকে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে বসে। তাদের থামানোর জন্যে ঢাকা থেকে যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয় তাদের সাথে সাধারণ জনগণের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট আর গভর্নমেন্ট হাউজ ছাড়া সারা বাংলাদেশে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা খুঁজে পাওয়া গেল না।[১৭] ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসাতেও সেদিন 'আমার সোনার বাংলা' গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।[১৮]

পরদিন ২৪ মার্চ, সারাদেশে একটি থমথমে পরিবেশ– মনে হয় এই দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস আগেই গণহত্যার খবরটি জেনে গিয়ে গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে ছিল।

গণহত্যার শুরু : অপারেশন সার্চলাইট

গণহত্যার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ তারিখটা বেছে নিয়েছিল কারণ সে বিশ্বাস করত এটা তার জন্যে একটি শুভদিন। দুই বছর আগে এই দিনে সে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে সে সন্ধেবেলা পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে দিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে বলেছিল, তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে![১৯] গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে করা আছে সেই নীল নকশার নাম অপারেশন সার্চলাইট[২০], সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপণ করা হবে, কীভাবে বাঙালি সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হবে, সোজা কথায়, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

শহরের প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হবে তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের কাজ শুরু করে দিল। শুরু হলো পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশী সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন।[২১]

ঢাকা শহরের নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পাকিস্তান মিলিটারি সব বাঙালি অফিসারকে হয় হত্যা না হয় গ্রেপ্তার করে নেয়, সাধারণ সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রাখে। পিলখানায় ই.পি.আরদেরকেও নিরস্ত্র করা হয়েছিল, তারপরেও

তাদের যেটুকু সামর্থ্য ছিল সেটি নিয়ে সারারাত যুদ্ধ করেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি এবং এই পুলিশবাহিনীই সবার আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সত্যিকার একটি যুদ্ধ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে গিয়ে ট্যাংক, মর্টার, ভারী অস্ত্র, মেশিনগান নিয়ে পালটা আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের নিয়ন্ত্রণ নেয়।[২২]

২৫ মার্চের বিভীষিকার কোনো শেষ নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আর জগন্নাথ হলের সব ছাত্রকে হত্যা করল। হত্যার আগে তাদের দিয়েই জগন্নাথ হলের সামনে একটি গর্ত করা হয়, যেখানে তাদের মৃতদেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটি বুয়েটের প্রফেসর নুরুল উলা তাঁর বাসা থেকে যে ভিডিও করতে পেরেছিলেন, সেটি এখন ইন্টারনেটে মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে, পৃথিবীর মানুষ চাইলেই নিজের চোখে সেটি দেখতে পারে।[২৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রদের নয়– সাধারণ কর্মচারী এমনকি শিক্ষকদেরকেও তারা হত্যা করে। আশেপাশে যে বস্তিগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মেশিনগানের গুলিতে অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে। এরপর তারা পুরানো ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলো আক্রমণ করে, মন্দিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করেছে সবাইকে পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে। ২৫ মার্চ ঢাকা শহর ছিল নরকের মতো, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে আগুন আর আগুন, গোলাগুলির শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার।

অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে বসে রইলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে।

স্বাধীন বাংলাদেশ

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন।[২৪] তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেল,

জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কিন্তু সেই বাংলাদেশ তখনো ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর। তার মাটিতে তখনো রয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দানবেরা।

প্রতিরোধ আর প্রতিরোধ

ঢাকা শহরে পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৭ মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে শহরের ভয়ার্ত নারী-পুরুষ-শিশু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে যেতে লাগল। জেনারেল টিক্কা খান ভেবেছিল সে যেভাবে ঢাকা শহরকে দখল করেছে, এভাবে সারা বাংলাদেশকে এপ্রিলের দশ তারিখের মাঝে দখল করে নেবে। কিন্তু বাস্তবে সেটি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন– বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা, এই দেশের ছাত্র-জনতা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনী এবং ই.পি.আর বিদ্রোহ করে শহরের বড়ো অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে শোনান।[২৫] এই ঘোষণাটি সেই সময় বাংলাদেশের সবার ভেতরে নূতন একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। বাঙালি যোদ্ধাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া এবং পাবনা শহর প্রথমে দখল করে নিলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শহরগুলো পুনর্দখল করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বগুড়া দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে– বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে শহরগুলোকে পুনর্দখল করে নেয়। যশোরে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করার সময় তারা বিদ্রোহ করে, প্রায় অর্ধেক সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারালেও বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারে। কুমিল্লা, খুলনা, ও সিলেট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের দখলে রাখলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।[২৬]

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সময়ে পাকিস্তান থেকে দুইটি ডিভিশন বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মিলিশিয়া বাহিনী আনা হয়, তার সাথে সাথে যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ। বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে ছড়িয়ে

পড়তে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড়ো বড়ো শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারে।[২৭]

পাকিস্তান সরকার ১১ এপ্রিল টিক্কা খানের পরিবর্তে জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীকে সশস্ত্রবাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

শরণার্থী

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মালম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি– যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।[২৮]

ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগে শোকে জর্জরিত, কলেরা ডায়রিয়া এরকম রোগে অনেক মানুষ মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই!

বাংলাদেশ সরকার

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেন। তখন তাঁর সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।

এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নূতন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।[২৯] তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

পালটা আঘাত

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করে পালটা আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল (অবঃ) এম. আতাউল গণি ওসমানীকে, চিফ অফ স্টাফ করা হয় লে. কর্নেল আবদুর রবকে এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালি, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে. এম সফিউল্লাহ এবং তারপর মেজর এ. এন. এম. নূরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর সি. আর. দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এবং তারপর মেজর এম.এ. মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. এ. জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্যে, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এই সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না, নৌ-কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এই নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে একটি অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন

দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৩০] ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের, নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্ব পালন করেন।

এই এগারোটি সেক্টর ছাড়াও জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং শফিউল্লাহ্‌র নেতৃত্বে তাঁদের ইংরেজি নামের অদ্যাক্ষর ব্যবহার করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইলে আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক বাহিনী ছিল। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী নামে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, এই বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন।[৩১] যুদ্ধের শেষের দিকে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীও যোগ দিয়েছিল এবং এই যুদ্ধে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্বও ছিল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর।[৩২]

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান মিলিটারির নাকের ডগায় ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক গেরিলা অপারেশন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ক্র্যাক প্লাটুন নামে দুঃসাহসী তরুণ গেরিলাযোদ্ধার একটি দল।[৩৩]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধ। এই দেশের অসংখ্য ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক যুদ্ধে যোগ দেয়, যুদ্ধে যোগ দেয় সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে জুতো কিংবা গায়ে কাপড় ছিল না, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল না– এমনকি যুদ্ধ করার জন্যে প্রশিক্ষণ নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের ভাষায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তাদের বুকের ভেতরে ছিল সীমাহীন সাহস আর মাতৃভূমির জন্যে গভীর মমতা। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন এই গেরিলাবাহিনী দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে– তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের গতিবিধি নিজেদের ঘাঁটির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে।

এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বলে কখনো শেষ করা যাবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারের নিজেদের লেখা বইয়ে একটি ছোট কাহিনি এরকম : ১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজশাহীর রোহনপুর এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। শত অত্যাচারেও সে মুখ খুলছে না। তখন পাকিস্তানি মেজর তাঁর বুকে স্টেনগান ধরে বলল, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে তোমাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। নির্ভীক সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নিচু হয়ে মাতৃভূমির মাটিকে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। আমার রক্ত আমার প্রিয় দেশটাকে স্বাধীন

করবে![৩৪] এই হচ্ছে দেশপ্রেম, এই হচ্ছে বীরত্ব এবং এই হচ্ছে সাহস। এঁদের দেখেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানত এই দেশটিকে তারা কখনোই পরাজিত করতে পারবে না, আগে হোক পরে হোক, পরাজয় স্বীকার করে তাদের এই দেশ ছেড়ে যেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের অনেক দেশের গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যেই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

দেশদ্রোহীর দল

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো বন্ধু ছিল না, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিছু দেশদ্রোহী। বাংলাদেশের মানুষ এদের সবাইকে নির্বাচনে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই দেশদ্রোহী মানুষগুলো ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরউদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী ফরিদ আহমেদ।[৩৫] এদের মাঝে জামায়াতে ইসলামী নামের রাজনৈতিক দলটির কথা আলাদা করে বলতে হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে রাজাকারবাহিনী তৈরি করা হয়েছিল– সেটি ছিল মূলত জামায়াতে ইসলামীরই সশস্ত্র একটি দল। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল জেনারেল নিয়াজীর কাছে এটা নিয়ে অভিযোগ করলে জেনারেল নিয়াজী তার অধস্তন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয় তখন থেকে রাজাকারদের আলবদর এবং আলশামস বলে ডাকতে![৩৬] এই রাজাকার কিংবা আলবদর ও আলশামসের মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই ছিল না[৩৭], কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদলেহী হিসেবে থেকে এরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছে তার অন্য কোনো নজির নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই দেশের মানুষকে চিনত না– আলবদর, আলশামস

প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের মানুষের কাছে এর চাইতে ঘৃণিত কোনো শব্দ নেই, কখনো ছিল না কখনো থাকবে না।

দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রবাসী অনেক বাঙালি মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে টাকা তুলেছেন, পাকিস্তানের গণহত্যার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন জাস্টিস আবু সায়ীদ চৌধুরী, স্থপতি এফ. আর. খান, প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূস এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। শুধু যে বাংলাদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, আগস্টের ১ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসন সহ অসংখ্য শিল্পীকে নিয়ে স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম একটি কনসার্ট সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিনসবার্গ শরণার্থীদের কষ্ট নিয়ে 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামে যে অসাধারণ কবিতাটি রচনা করেন, সেটি এখনো মানুষের বুকে শিহরণের সৃষ্টি করে।[৩৮]

পক্ষের দেশ বিপক্ষের দেশ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার কথা পৃথিবীতে প্রচার হওয়ার পর পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেরই সমবেদনা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, তবে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। একাত্তরে যদিও ইসলামের নামে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমানকেই হত্যা করা হচ্ছিল, তার পরেও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশও পাকিস্তানের পক্ষে থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। যদিও রাজনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার দৃশ্য দেখে সে সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার কে. ব্লাড ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন সেটি কূটনৈতিক জগতে সবচেয়ে কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও নিউক্লিয়ার ক্ষমতাধারী যুদ্ধজাহাজ এই এলাকায় রওনা করিয়ে দিয়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি সত্যি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপলক্ষ করে বিশ্বের দুই পরাশক্তি নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল।[৩৯]

স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথবাহিনীর জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখন সেই বিজয়ের মুহূর্তটিকে থামিয়ে দেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে আমাদের বিজয়ের পথ সুনিশ্চিত করেছিল। তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে দেশটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দেশ হচ্ছে ভারত। এই দেশটি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় দেড়হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল।[৪০]

যৌথবাহিনী

জুলাই মাসের দিকে নূতন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।[৪১]

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল।[৪২] কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয়– এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সব

পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী– নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল– তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল![৪৩]

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না![৪৪]

আত্মসমর্পণ

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা 'মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।'[৪৫]

ঢাকার 'পরম পরাক্রমশালী' পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তানি জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই![৪৬]

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল।

বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।

বিজয়ের আনন্দে দুঃখের হাহাকার

পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ের অবিশ্বাস্য আনন্দ উপভোগ করার আগেই একটি ভয়ংকর তথ্য বাংলাদেশের সকলকে স্তম্ভিত করে দিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন সবাই বুঝে গেছে এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, সত্যি সত্যি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিচ্ছে, তখন এই দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল আলবদর বাহিনী দেশের প্রায় তিনশত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে দেশের মানুষ যখন পাগলের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন তাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রায়ের বাজার বধ্যভূমি এবং অন্যান্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল। দেশটি যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তারপরেও যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই ব্যাপারটি এই বিশ্বাসঘাতকের দল নিশ্চিত করে যাওয়ার জন্য এই দেশের সোনার সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত আলবদর বাহিনীতে ছিল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চৌধুরী মইনুদ্দিন, আশরাফুজ্জামান খান[৪৭], মতিউর রহমান নিজামী (পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক)[৪৮] এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর কেন্দ্রীয় সংগঠক)।[৪৯]

আমাদের অহংকার

আমাদের মাতৃভূমির যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওপরে তাকালে যে আকাশ আমরা দেখতে পাই কিংবা নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা বুকের ভেতর টেনে নেই, তার সবকিছুর জন্যেই আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঋণী। সেই ঋণ বাঙালি জাতি কখনোই শোধ করতে পারবে না, বাঙালি কেবল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করার একটুখানি সুযোগ পেয়েছে তাঁদেরকে বীরত্বসূচক পদক দিয়ে সম্মানিত করে।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে সাতজন হচ্ছেন মরণোত্তরে সবচেয়ে বড়ো পদকপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁরা হচ্ছেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, হামিদুর রহমান, মোস্তফা কামাল, রুহুল আমীন, মতিউর রহমান, মুন্সী আব্দুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এঁদের মাঝে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ ছিল পাকিস্তানে এবং বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ ছিল ভারতে। তাঁদের দুজনের দেহাবশেষই এখন বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অন্য বীরশ্রেষ্ঠ এবং অসংখ্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাথে তাঁদের দুজনকেও এখন গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে আছে আমাদের মাতৃভূমির মাটি।

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদান রাখার জন্যে যাঁদের বীরত্বসূচক পদক দেয়া হয়, তাঁদের মাঝে নারী মুক্তিযোদ্ধারাও আছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দেশের নারীরা শুধু যে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য সহায়তা করেছেন তা নয়, অস্ত্র হাতে পুরুষদের পাশাপাশি তাঁরা যুদ্ধও করেছেন।[৫০]

যুদ্ধের গ্লানি

যেকোনো যুদ্ধই হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা– যুদ্ধের সাথে কোনোভাবে সম্পর্ক না থাকার পরও যুদ্ধের সময় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়– আমাদের দেশেও সে ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে এক ধরনের অমানুষিক নৃশংসতায় বাঙালিদের নির্যাতন নিপীড়ন আর হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। তাদের নৃশংসতার জবাবে মুক্তিযুদ্ধের আগে, পরে এবং চলাকালে অনেক বিহারিকে হত্যা করা হয়, যার ভেতরে অনেকেই ছিল নারী, শিশু কিংবা নিরপরাধ। বিহারিদের প্রায় সবাই পাকিস্তানে ফেরত যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও পাকিস্তান সরকার তাদের নিজের দেশে নিতে আগ্রহী নয় বলে এই হতভাগ্য সম্প্রদায় দীর্ঘদিন থেকে জেনেভা ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

গণহত্যার পরিসংখ্যান

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার, মিলিশিয়া বাহিনী ছিল আরো ২৫ হাজার, বেসামরিক বাহিনী প্রায় ২৫ হাজার, রাজাকার, আলবদর, আলশামস আরো ৫০ হাজার। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা মিত্রবাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধ শেষে আত্মসমর্পণের পর প্রায় একানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ভারতে স্থানান্তর করা হয়।[৫১]

যুদ্ধ চলাকালে প্রায় আড়াই লক্ষ নারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল– অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, এই এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ না করলে তাদের প্রত্যেককেই হয়ত এই দেশে হত্যা করা হতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা চলাকালে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে সে সম্পর্কে গণমাধ্যমে বেশ কয়েক ধরনের সংখ্যা রয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আলমানাকে সংখ্যাটি ১০ লক্ষ, নিউ ইয়র্ক টাইমস (২২ ডিসেম্বর ১৯৭২) অনুযায়ী ৫ থেকে ১৫ লক্ষ, কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ।[৫২] প্রকৃত সংখ্যাটি কত, সেটি সম্ভবত কখনোই জানা যাবে না। তবে বাংলাদেশে এই সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়।

স্বাধীনতার পর

বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে আটক, জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এবং হত্যা করার পর তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করার জন্যে জেলখানায় তাঁর জন্যে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত হবার পর বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে আসেন[৫৩] এবং ১৫ মার্চের ভেতর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজ দেশে ফিরে যায়।

বিজয়ের আনন্দ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পর দেশের মানুষের ভেতর ভবিষ্যৎ নিয়ে যে স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের নূতন সরকারের জন্যে সেটি পূরণ করা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। যারা সরকার চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে তাদের কারো সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে রাস্তাঘাট কলকারখানা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে, দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। রাজনীতিতেও ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়– মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি দেশ পরিচালনা করেছেন সেই তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে বঙ্গবন্ধুর একটি দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। শুধু দেশের ভেতর থেকে নয় দেশের বাইরেও ষড়যন্ত্র শুরু হলো, দেশে যখন খাদ্যের ঘাটতি তখন চাল বোঝাই জাহাজ হঠাৎ করে বাংলাদেশে না এসে অন্যদিকে চলে গেল।[৫৪] মানুষের ক্ষুধা– দেশে দুর্ভিক্ষ। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সেই বিশৃঙ্খলা দমন করার চেষ্টা করছে রক্ষীবাহিনী। সব মিলিয়ে যখন দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগ সরকার তখন 'বাকশাল' তৈরি করে একদলীয় শাসন চালু করার চেষ্টা করল– যে কাজটি স্বাধীনতার পরে পরেই গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ছিল, চার বছর পর সেটি কারো কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। চারিদিকে অসন্তোষ, ক্ষোভ।

দেশের এরকম দুঃসময়ের একটি সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ অফিসার বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে ফেলল, নববিবাহিতা বধূ কিংবা শিশু সন্তানটিও সেই নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পেল না। এখানেই শেষ নয়, আওয়ামী লীগের সবচেয়ে প্রবীণ চারজন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে জেলখানায় আটকে রেখে তাঁদের সেখানেই হত্যা করা হলো। যেন এটি সভ্য জগৎ নয়– যেন এটি বর্বর মানুষের দেশ।

শুরু হলো অন্ধকার জগৎ। বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশদ্রোহীদের একটি অংশকে ক্ষমা করেছিলেন– কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী, যারা খুন, জখম, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছিল তাদের কাউকে ক্ষমা করা হয় নি। এরকম ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের জন্যে আটক রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার তাদের ক্ষমা করে দিল।[৫৫] যুদ্ধাপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে তাদের পুনর্বাসিত করতে থাকে পরবর্তী সামরিক সরকার আর স্বৈরশাসকেরা। ১৯৭২ সালে যে অপূর্ব সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেটিতে একটির পর একটি পরিবর্তন এনে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো রাষ্ট্রের মূল আদর্শে হাত দেয়া শুরু হলো।[৫৬] ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা স্থান করে নিতে থাকল সরকারের ভেতর, সমাজের ভেতর।

সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর পর, দীর্ঘ আন্দোলন করে ৯০ সালে আবার দেশটিকে গণতন্ত্রের পথে তুলে দেয়া হয়। সেই থেকে বাংলাদেশ আবার একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

শেষ কথা

আমাদের দুঃখী দেশটি আমাদের বড়ো ভালোবাসার দেশ, বড়ো মমতার দেশ। যাঁরা জীবন বাজি রেখে এই স্বাধীন দেশটি আমাদের এনে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর যেসব স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধী এই স্বাধীন রাষ্ট্রটিকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে তাদের জন্যে রয়েছে অন্তহীন ঘৃণা। আজ থেকে একশ' বছর কিংবা হাজার বছর পরেও– যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে, এই দেশের মানুষ স্বাধীনতা বিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করবে না।

আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নূতন প্রজন্ম মাতৃভূমিকে ভালোবাসার তীব্র আনন্দটুকু অনুভব করতে শিখবে। তারা তাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে ঘুরে ঘুরে অভিমানী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করে তাদের হাত স্পর্শ করে বলবে, আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দেয়ার জন্যে ভালোবাসা এবং ভালোবাসা। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের

চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বলবে, আমরা তোমাদের কথা দিচ্ছি, তোমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলে আমরা সেই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব। তোমাদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করব।

তথ্যসূত্র

১ A Short History of Pakistan, I.H.Qureshi (1992)

২ মুক্তিসংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক, পৃষ্ঠা ৩২-৩৮ ও Bangladesh Fights for Independence. Lieutenant General ASM Nasim Bir Bikram, page 14-17

৩ মহান একুশে সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ, পৃষ্ঠা ১৫৬৭ - ১৫৬৯

৪ ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর , আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত

৫ মুক্তিসংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক, পৃষ্ঠা ৩৭

৬ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, মুনতাসীর মামুন পৃষ্ঠা ১৭

৭ মুক্তিসংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক পৃষ্ঠা ৫৫

৮ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, মুনতাসীর মামুন পৃষ্ঠা ১৮

৯ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খণ্ড

১০ Muktibahini Wins Victory, Major General ATM Abdul Wahab, page 67

১১ মুক্তিসংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক, পৃষ্ঠা ১২০-১২১

১২ দি আলটিমেট ক্রাইম, সরদার মুহাম্মদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৭-২৯

১৩ The Last Days of United Pakistan, G.W. Choudhury, page 152

১৪ ৭১ এর দশ মাস, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, পৃষ্ঠা ১৪-১৯

১৫ মুক্তিসংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক, পৃষ্ঠা ২১২-২১৪

১৬ মুক্তিসংগ্রাম, আবুল কাসেম ফজলুল হক, পৃষ্ঠা ২২৩-২২৫

১৭ Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 67-68

১৮ Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 67-68

১৯ Massacre [1972], Robert Payne, page 50

২০ The Evidence, Vol 1, Mir Shawkat Ali, page 196

২১ Bangladesh Fights for Independence, Lieutenant General ASM Nasim Bir Bikram, page 557

২২ Bangladesh at War, Major General K.M. Safiullah, page 27

২৩ Bangladesh Genocide Archive, www.genocidebangladesh.org

[২৪] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 75
[২৫] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৩৬-৪২
[২৬] A Tale of Millions, Rafiqul Islam BU
[২৭] Bangladesh Fights for Independence, Lieutenant General ASM Nasim Bir Bikram, page 35-37
[২৮] Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh, Salam Azad, page 180
[২৯] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ. টি. ইমাম, পৃষ্ঠা ৬৩
[৩০] মুক্তিযুদ্ধে নৌ অভিযান, কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, পৃষ্ঠা ৬৬
[৩১] স্বাধীনতা '৭১, কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, পৃষ্ঠা ৫৫০- ৫৫২
[৩২] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ. টি. ইমাম, পৃষ্ঠা ১৫৩
[৩৩] Brave of Heart, habibul Alam Birpratik
[৩৪] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 104
[৩৫] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 92-93
[৩৬] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 105
[৩৭] স্বাধীনতা '৭১, কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, পৃষ্ঠা ৪৪৭- ৪৪৮
[৩৮] http://www.genocidebangladesh.org/?p=21
[৩৯] মূলধারা ৭১, মইদুল হাসান
[৪০] Contribution of India in the war of Liberation of Bangladesh, Salam Azad, page 323-481
[৪১] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 101
[৪২] জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা, মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া
[৪৩] The Times of India, 3 May 2005
[৪৪] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 199
[৪৫] Brave of Heart, Habibul Alam Birpratik
[৪৬] Witness to Surrender, Siddiq Salik, page 211
[৪৭] একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়, ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯২
[৪৮] মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ. এস. এম. শামছুল আরেফিন, পৃষ্ঠা ৪২৭
[৪৯] ফোর্ট নাইটলি সিক্রেট রিপোর্ট অন দা সিচুয়েশন ইন ইস্ট পাকিস্তান
[৫০] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : নারী, সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধ গবেষনা কেন্দ্র
[৫১] Figures from the fall of Dacca by Jagjit Singh Aurora in the Illustrated Weekly of India, 23 December 1973
[৫২] Mathew White's, Death tolls for the major wars and atrocities of the twentieth century
[৫৩] Sheikh Mujib Triumph and Tragedy, S. A. Karim, page 259
[৫৪] Sheikh Mujib Triumph and Tragedy, S. A. Karim, page 337
[৫৫] The Daily Star, December 14, 2008
[৫৬] বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, পৃষ্ঠা ৯৯